একটি সত্যনিষ্ঠ দলের প্রয়োজন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.

একটি সত্যনিষ্ঠ দলের প্রয়োজন

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ আকরাম ফারূক

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ১৪৩

১৬শ প্রকাশ
শাওয়াল ১৪৩৫
ভাদ্র ১৪২১
আগষ্ট ২০১৪

বিনিময় ঃ ১০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

EKTI SHATTA NISHTTAH DALER PRAYOJAN. by Sayeed Abul A'la Moududi. Published by Adhunik Prokashani, 25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25, Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 10.00 Only

বস্তুবাদী সভ্যতার আর কিছু দেবার নেই। বিশ্ব মানবতার জন্যে তা আজ এক মহা যাতনার কারণ। গায়ে একটা প্রবল ধাক্কা লাগলেই এ সভ্যতা সশব্দে ভেঙ্গে পড়বে। এ ধাক্কা লাগানোর জন্যে প্রয়োজন নতুন শক্তির—একটি সত্যনিষ্ঠ দলের। সে দলের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন এ যুগের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী চিন্তা নায়ক সাংগঠনিক প্রজ্ঞার অধিকারী সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। আমাদের বিশ্বাস, মুসলিম মিল্লাত তাঁর এ লেখা থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

—প্রকাশক।

بسم الله الرحمن الرحيم

একটি সত্যনিষ্ঠ দলের প্রয়োজন

পৃথিবীতে বর্তমানে একটা মহাপ্রলয় চলছে। এর উদ্দেশ্য কি কেবল বিশ্ববাসীকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি দেয়া অথবা প্রলয়ের পর ভালো একটা কিছু সৃষ্টি করা—তা আমরা জানি না। তবে বাইরের লক্ষণ দেখে আচ করা যায়, এ যাবত যে সভ্যতার ধ্বজাধারীরা মানব জাতির নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে, তাদের আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে এসেছে। তাদের পরীক্ষার মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। আল্লাহর শাশ্বত বিধান অনুযায়ী তাদেরকে ও তাদের এ জাহিলী সভ্যতাকে পৃথিবীতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থেকে হটিয়ে দেয়ার সময় আগত প্রায়। পৃথিবীতে তাদের দায়িত্ব পালনের যেটুকু সুযোগ পাওয়া দরকার ছিল তা তারা পেয়েছে। নিজেদের যাবতীয় গুণপনা এবং সমস্ত প্রচ্ছন্ন যোগ্যতা ও প্রতিভাকে তারা সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়েছে। তাদের ভেতর হয়তো এমন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই যা প্রকাশ পায়নি। তাই মনে হচ্ছে, খুব শিগ্‌গীর পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে তারা অপসারিত হবে। বিশ্বব্যাপী তাদের এ ব্যাপক পরাজয়ের মহড়া সম্ভবত এজন্যেই চলছে, যাতে করে তারা নিজেদের মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা নিজেরাই করে রেখে যেতে পারে। এরপর সারা দুনিয়ায় আবার একটা অন্ধকার যুগও এসে যেতে পারে, যেমন সর্বশেষ ইসলামী আন্দোলনের পতন ও বর্তমান জাহেলী সভ্যতার আবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়ে এসেছিল। আবার এ ভাঙ্গার ভেতর দিয়ে নতুন করে একটা গড়ার পালাও শুরু হতে পারে।

পুঁজিবাদী গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্র (National Socialism) এবং কমিউনিজমের যে শক্তিগুলো আজ পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত, তারা আসলে আলাদা আলাদা সভ্যতার ধারক নয়। তাই তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে ভালোটিকে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। আসলে এরা একই সভ্যতার তিনটে শাখা। বিশ্ব প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে এদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন। একই জীবন দর্শন ও একই নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে এদের কাঠামো তৈরী হয়েছে। মানুষকে পশু মনে করা,* বিশ্বজগতকে স্রষ্টা বিহীন ঠাওরানো, প্রকৃতি-বিজ্ঞান থেকে মানব জীবন পরিচালনার জন্য আইন আহরণ করা এবং অভিজ্ঞতা, স্বার্থপরতা ও প্রকৃতির লালসাকে নৈতিকতার ভিত্তি রূপে গণ্য করা—এসবই হলো এ তিনটি সংঘর্ষশীল আদর্শের সাধারণ উপাদান। এদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এ জাহেলী সভ্যতা সর্বপ্রথমে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাতন্ত্রের বীজ বপন করেছিল। তার ফলে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী

---

* এ প্রবন্ধ লেখার সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। লেখক সে দিকেই ইংগিত করেছেন।

গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে এবং দীর্ঘকাল ব্যাপী মানব জাতি এর হাতে নিস্পেষিত ও নির্যাতিত হতে থাকে। এর যুলুম ও নিস্পেষণ যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে শুরু করে তখন ঐ একই সভ্যতা সমাজতন্ত্রকে তার প্রতিকারের উপায় হিসেবে পেশ করে। কিন্তু এ প্রতিকার যে মূল রোগের চেয়েও মারাত্মক তা অল্প দিনেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। অবশেষে সেই একই সভ্যতার পক্ষ থেকে ফ্যাসিবাদ অথবা জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্র নামে প্রতিকারের দ্বিতীয় উপায় উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, 'জাহেলিয়াত জননীর এ সর্বশেষ সন্তানটি নাশকতা ও বিপর্যয় সৃষ্টিতে আগের দুই সন্তানকেও হার মানিয়েছে।'

এভাবে যে সভ্যতা মানুষকে লাগামহীনভাবে বিচরণশীল পশু মনে করে দুনিয়ার বুকে আপন দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেছে এবং মানুষকে পররাজ্য গ্রাস থেকে শুরু করে জঘন্যতম নৃশংসতা পর্যন্ত কোনো মানবতা বিধ্বংসী ব্যাধি উপহার দিতে বাদ রাখেনি,—তাকে পরীক্ষা করে দেখার আর কোনো অবকাশ নেই। এ সভ্যতা বাস্তবিক পক্ষে তার সকল শাখা-প্রশাখা সমেত স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছে। তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তার কাছে এখন আর এমন কোনো দাওয়াই অবশিষ্ট নেই, যা সে মানব জাতির সমস্যা সমাধানের জন্য দিতে পারে। তবুও যদি ধরে নেয়া যায় যে, নিজের আয়ুষ্কাল আরো কিছুটা বাড়িয়ে নেয়ার জন্য সে আরো একটা 'ইজম' বা মতবাদ হাজির করবে, তাহলেও আল্লাহ নিজের গড়া পৃথিবীটাকে নৈরাজ্য দিয়ে ভরে তোলার আরো সুযোগ তাকে দেবেন, তা মনে হয় না। হতে পারে, বর্তমান সংঘর্ষের পর এর শাখা-প্রশাখাগুলোর মধ্যে কোনোটা অবশিষ্ট থেকে যাবে। তবে তা যে খুবই ক্ষণস্থায়ী হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেই শাখার মধ্য থেকে শিগ্গীরই আগুনের শিখা বের হবে এবং সেই আগুনেই সে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

এখন প্রশ্ন হলো, এ সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর দুনিয়াতে কি আবার কোনো অন্ধকার যুগ শুরু হবে, না নতুন কোনো গঠন প্রক্রিয়া দানা বাঁধবে ? এ প্রশ্নের মীমাংসা নির্ভর করে দুটো জিনিসের ওপর।

প্রথমত, বর্তমান নিরেট জাহেলিয়াতের ব্যর্থতার পর আগেকার ভ্রান্ত মতবাদগুলোর চেয়ে ভালো কোনো মতবাদ মানুষের হস্তগত হবে কিনা, মানুষ যার কাছ থেকে কল্যাণ লাভের আশা করবে। যার ভিত্তিতে একটি শক্তিমান ও জীবন্ত সভ্যতা গড়ে ওঠা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয়ত, একটি নতুন মতাদর্শের ভিত্তিতে নতুন সভ্যতা বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে সর্বাত্মক জিহাদ পরিচালনার যে যোগ্যতা ও ক্ষমতা প্রয়োজন এবং যে প্রখর ধীশক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তির দরকার সেই শক্তি ও যোগ্যতা সম্পন্ন একটি

মানব গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটবে কিনা। এ মানব গোষ্ঠীর নৈতিক গুণাবলী বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার ধারকদের ঘৃণ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তুলনায় অনেক ভালো ও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হবে।

এ ধরনের কোনো একটা মতাদর্শ যদি সত্যিই সময় মত হস্তগত হয়ে যায় এবং তার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নের জন্য একটি অভীপ্সিত সত্যনিষ্ঠ দল তৎপর হয়ে উঠে তাহলে অবশ্যই মানব জাতি আবার একটা অন্ধকার যুগের খপ্পরে পড়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। অন্যথায় এ অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার হাত থেকে তাকে রক্ষা করার ক্ষমতা কারোর নেই।

আজ মানবজাতি এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। মানুষ মানুষের সাথে বন্য পশুর চেয়েও হিংস্র আচরণ করছে। আদিম ও অসভ্য যুগেও মানুষ এ ধরনের নির্মমতা ও নৃশংসতার আশ্রয় নেয়নি। মানুষের আজকের নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতার নজীর বন্য পশুদের মধ্যেও পাওয়া যাবে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষের ফল দাঁড়িয়েছে বোমা মেরে দেশের পর দেশ জ্বালিয়ে দেয়া এবং ট্যাংক চালিয়ে নিরীহ জনগণকে পিষ্ট করা। মানুষের সাংগঠনিক যোগ্যতাকে আজ সভ্যতা বিধ্বংসী আগ্রাসী সেনাবাহিনী সংগঠনের কাজে লাগানো হচ্ছে। ভয়াবহ মারণাস্ত্র তৈরী আজকের শিল্পোন্নতির অন্যতম ফসলে পরিগণিত হয়েছে। প্রচার যন্ত্রগুলো পৃথিবী ব্যাপি মিথ্যা রটনা ও জাতিতে জাতিতে রেষারেষী, হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির চরম পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে। এসব কিছু মিলে আজ যে বিভীষিকাময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তা কোনো মানুষকে হতাশার গবীর আবর্তে তলিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট। এ অবস্থা মানুষকে ভগ্নহৃদয় করার এবং নিজের সমস্ত যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে তাকে চরম নৈরাশ্যে নিমজ্জিত করার ক্ষমতা রাখে। আর এ নৈরাশ্যের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে মানবজাতি চরম বিতৃষ্ণায় বহু শতাব্দীকালের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন ও অচেতন হয়ে যাবে।

আমি আগেই বলেছি যে, এহেন শোচনীয় ও বেদনাদায়ক পরিণতি থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হলো, একটি গঠনমূলক মতাদর্শের সক্রিয় হয়ে ওঠা ও একটি সত্যনিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর আবির্ভাব।

কিন্তু সেই সম্ভাব্য মতাদর্শ—যা আজকের পরিবেশে সাফল্যমণ্ডিত হতে সক্ষম—কোন্‌টি ?

এ ক্ষেত্রে যদি আদিম অংশীবাদী জাহেলিয়াতের কথা পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, প্রাচীন যুগে বহু বড় বড় সভ্যতা জন্ম দেয়া সত্ত্বেও তা এখন মৃত। এর পুনরুজ্জীবনের আর কোনো সম্ভাবনা নেই। শির্ক বা অংশীবাদী নির্মূল হয়ে গেছে। অজ্ঞ মানুষের জীবনে এর কিছু প্রভাব থাকলেও বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীজনদের এখন আর এতে বিশ্বাস নেই। বিশ্বজগতের

পরিচালনায় অনেকগুলো মাবুদ নিয়োজিত রয়েছে এবং দেবদেবী বা আত্মাদের হাতে মানুষের কল্যাণ অকল্যাণের চাবিকাঠি নিহিত রয়েছে এমন অলীক খেয়ালে তারা আর মত্ত থাকতে প্রস্তুত নয়। তাছাড়া অংশীবাদী ধ্যান-ধারণা দ্বারা মানব জীবনের জটিল সমস্যাবলীর সমাধান হতে পারে না, এটা একটা বাস্তব সত্য। সমাধান তো দূরের কথা এর ফলে সমস্যাগুলো আরো জটিল হয়ে পড়ে। আজকের দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সমস্যা মানব জাতির মধ্যে ঐক্য ও সংহতির অভাব। অংশীবাদ এ সমস্যার কোনো সমাধান তো করেই না, বরং তা অধিকতর অনৈক্য ও বিভেধ সৃষ্টিতেই নিয়োজিত। সুতরাং কোনো অংশীবাদী মতাদর্শের আজকের বিশ্বে প্রতিপত্তি ও আধিপত্যলাভের কোনোই অবকাশ নেই।

এরপরে আসে বৈরাগ্যবাদের সম্ভাব্য ভূমিকার কথা। বৈরাগ্যবাদ কোনো শক্তি বলে গণ্য হয়নি, এখনো হতে পারে না। জন্মান্তরবাদ, অহিংসবাদ, সর্বেশ্বরবাদ ইত্যাকার মতবাদগুলোর—যা মানবাত্মাকে হিমাগারে পাঠিয়ে দেয়, সাহস ও উৎসাহকে স্তিমিত ও নিস্তেজ করে এবং মানুষের চিন্তাশক্তিকে অলীক কল্পনার উন্মত্ততায় মাতিয়ে অকর্মণ্য ও নির্জীব করে রাখে—এতটা জীবনী শক্তিই নেই যা পৃথিবীর কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও পরিচালনাভার গ্রহণে সক্ষম কোনো সভ্যতা জন্ম দিতে পারে। কোনো যাদুকর এগুলোর মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চারের হাজারো চেষ্টা করলেও এগুলো কখনো জ্ঞান, তপস্যা ও ত্যাগের স্তর ছাড়িয়ে একটি গৌরবোজ্জল সভ্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে না। কাজেই এসব মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া একমাত্র মৃত ও পতনোন্মুখ জাতিদের পক্ষেই সম্ভব। কোনো জীবন্ত ও উদীয়মান জাতি এর প্রতি কোনো রকম আকর্ষণ অনুভব করতে পারে না।

আর নিরেট জাহেলিয়াতের (যা আদৌ কোনো আধ্যাত্মিকতা ও অতি প্রাকৃতিক সত্তায় বিশ্বাস করে না এবং জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বস্তু নির্ভর মনে করে) পর্যালোচনায় গেলে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, এ সম্পর্কে বিশ্ববাসীর এতবেশী তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, তারা অচিরেই এ থেকে চূড়ান্তভাবে নিরাশ হয়ে যাবে। নিরেট জাহেলিয়াতের দরুনই মানুষ নিজেকে পশু ভাবতে শিখেছে আর সে জন্য পশুদের জীবন থেকেই আহরণ করেছে সে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং যোগ্যতমের বাঁচার অধিকার ইত্যাকার মতবাদ। নিজেকে পশু ভাবার কারণেই বস্তুগত স্বার্থ উদ্ধার ও জৈবিক লালসা চরিতার্থ করাকে সে জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য হিসেবেই নির্ধারণ করেছে, অভিজ্ঞতা ও স্বার্থ সিদ্ধিকে গ্রহণ করেছে নৈতিকতার উৎস ও ভিত্তি হিসেবে, আর মানুষের চেয়ে উচ্চতর কোনো সার্বভৌম শক্তির কর্তৃত্ব না মানাই হয়েছে তার নীতি। এর ফল যা হবার তাই হয়েছে এবং তা অত্যন্ত বিষময় হয়েই দেখা দিয়েছে। এসব মতবাদের দরুন

মানুষের মধ্যে জাতীয় ও বর্ণগত আভিজাত্যবোধ ও একদেশদর্শিতার প্রসার ঘটেছে। জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্ম হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও অর্থনৈতিক শোষণের মত মারাত্মক আপদ মাথা তুলেছে। নিজস্ব ব্যাপারে ব্যক্তি থেকে শুরু করে বড় বড় জাতি ও সাম্রাজ্য পর্যন্ত নৈতিকতার কোনো তোয়াক্কা করে না। সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার এই যে, মানুষ সত্যি সত্যি পশুর মত কাজ করা শুরু করেছে এবং অন্যান্য মানুষের সাথে পাশবিক ও যান্ত্রিক আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছে। এসব মতবাদ সমাজে হয় গণতন্ত্রের নামে একজনের ওপর আর একজনের অত্যাচারের, অবৈধ আয়ের এবং অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা করার অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছে, নয়তো সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের নামে মানুষকে ছাগল ভেড়ার পালের মত একটি স্বৈরাচারী দলের হাতে সঁপে দিয়েছে, যেন তাদেরকে যেদিক খুশি তাড়িয়ে নেয়া যায় অথবা তাদের সাহায্যে যেমন খুশী স্বার্থ উদ্ধার করা যায়। এ মতবাদগুলোর এই যে পরিণতি দেখা দিয়েছে তা কোনো আকস্মিক ভুল-ভ্রান্তির ফল নয় বরং ঐ বিষবৃক্ষেরই স্বাভাবিক বিষফল। সুতরাং মানুষ যেমন এ যাবত এগুলো থেকে কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারেনি, তেমনি ভবিষ্যতেও পারবে না। বস্তুত মানুষ সম্পর্কে এরূপ পশুসুলভ ধারণা, জীবন ও জগত সম্পর্কে এমন জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং এহেন অভিজ্ঞতা ও স্বার্থপরতা ভিত্তিক নৈতিকতার ভিত্তিতে এমন কোনো সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠা সম্ভবই নয়—যা মানুষের জন্য যথার্থ কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

এসব মতবাদ ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর মানবজাতি একমাত্র এমন একটি মতবাদ থেকে সার্বিক কল্যাণ আশা করতে পারে যার বৈশিষ্ট্য হবে নিম্নরূপ ঃ

—সে মতবাদ মানুষকে মানুষই মনে করবে, পশু নয়। মানুষকে নিজের সম্পর্কে ভালো জ্ঞান পোষণে উদ্বুদ্ধ করবে। পাশ্চাত্যের জড়বাদী দর্শন যেমন মানুষকে নিছক পশুরূপে গণ্য করে, খৃষ্টবাদ যেমন তাকে 'জন্মগত পাপী' বলে মনে করে এবং হিন্দু দর্শন যেমন তাকে 'পুনর্জন্মবাদের শৃংখলাবদ্ধ' মনে করে,—এ মতবাদ তেমন মনে করবে না, বরং তাকে এসবের অনেক উর্ধ্বে মনে করবে।

—সে মতবাদ মানুষকে চরম স্বেচ্ছাচারী ও লাগামহীন জীব মনে করবে না, বরং তাকে বিশ্ব সম্রাটের ক্ষমতার অধীন ও তাঁর কাছে দায়ী বলে ঘোষণা করবে।

—সে মতবাদ মানুষকে এক বাস্তব ও কার্যোপযোগী নৈতিক বিধানের আওতাধীন করবে এবং তাকে সেই নৈতিক বিধানে আপন প্রকৃতির খেয়াল-খুশীমত রদবদল করতে দেবে না।

—সে মতবাদ বস্তুগত ভিত্তিতে মানবজাতিকে বিভক্ত করবে না বরং তার পরিবর্তে মানবজাতির ঐক্যের জন্য এমন একটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি গড়ে তুলবে, যার ওপর মানবজাতি সত্যিই ঐক্যবদ্ধ হতে সক্ষম।

—সমাজ জীবনের জন্য সে মতবাদ যেসব মূলনীতি দেবে তার আলোকে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ও জাতিতে জাতিতে সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

—সে মতবাদ মানুষকে আত্মতুষ্টি ও আত্মপূজার চেয়ে উচ্চতর জীবন লক্ষ্য এবং জীবনের জড়বাদী ও বস্তুবাদী মূল্যবোধের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মূল্যবোধ শিক্ষা দেবে।

—সর্বোপরি সে মতবাদ মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তামাদ্দুনিক উন্নতিতে শুধু সাহায্যই করবে না, বরং সুষ্ঠু ও নির্ভুল পথনির্দেশও দেবে। মানবজাতিকে নৈতিক ও বস্তুগত উভয় দিক দিয়ে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এ ধরনের মতবাদ ইসলাম ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মানবজাতির ভবিষ্যত এখন ইসলামের ওপরই নির্ভরশীল। মানুষের নিজের রচিত সমস্ত মতবাদ ব্যর্থ হয়ে গেছে। সেসব মতবাদের একটিরও আর সাফল্যের কোনো অবকাশ নেই। এমনকি মানুষের মধ্যে এখন সেই উৎসাহ-উদ্দীপনাও নেই যে, নতুন করে কোনো মতবাদ রচনা করবে এবং তার পরীক্ষা-নিরিক্ষায় নিজের ভাগ্যকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেবে। এমতাবস্থায় যে মতবাদ ও মতাদর্শের ওপর মানুষ নিজের সার্বিক কল্যাণের জন্য নির্ভর করতে পারে, যে মতবাদ সমগ্র মানবজাতির জন্য এক স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থায় পরিণত হতে সক্ষম এবং যে মতবাদ গ্রহণ করে মানব জাতি সর্বগ্রাসী ধ্বংস ও বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে পারে, তা একমাত্র ইসলাম ছাড়া আর অন্য কিছুই হতে পারে না।

তাই বলে একথা ভেবে নেয়া ঠিক হবে না যে, পৃথিবীটা ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে ; কেবল ইসলামের গুণাবলী বর্ণনা করে ইসলামের ওপর ঈমান আনার জন্য একটা দাওয়াতনামা প্রচার করতে পারলেই হলো, তাহলেই এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা একে একে তার বশ্যতা স্বীকার করতে শুরু করবে। যে সভ্যতা একদা জাঁকালোভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো তার পতন হঠাৎ এমন আকস্মিকভাবে হয় না। অনুরূপ পরবর্তী সভ্যতার উত্থানও এমন নাটকীয়ভাবে হয় না। কাল যেখানে ধু ধু মাঠ ছিল, আজ সেখানে রাতারাতি আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের জোরে এক সুবিশাল প্রাসাদ গড়ে উঠলো, এমনটি হয় না।

একটি পতনোন্মুখ সভ্যতা আপন ধ্যান-ধারণা ও রীতিনীতির বদৌলতে সুদীর্ঘকালব্যাপী মানুষের মন-মগজ, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সমাজ-সভ্যতার ওপর

প্রভাবশীল থাকতে পারে। সে প্রভাব আপনা-আপনি দূর হয় না, শক্তি প্রয়োগে দূর করতে হয়। অনুরূপভাবে পতনোন্মুখ সভ্যতার ধারক-বাহকরা অবধারিত পতনের মুখেও বহু বছর যাবত পৃথিবীর ওপর আপন আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। তারা স্বেচ্ছায় হটে যায় না, তাদেরকে হটিয়ে দিতে হয়। একইভাবে নতুন সভ্যতার রূপরেখার ওপর একটি সভ্যতার প্রাসাদ গড়ে তোলাও চাট্টিখানি কথা নয়। আরাম কেদারায় বসে তা গড়া যায় না। সে জন্য প্রয়োজন হয় শক্তিশালী আন্দোলনের, প্রয়োজন হয় কঠোর সমালোচনা এবং জরাজীর্ণ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার ও নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার অক্লান্ত ও অব্যাহত প্রয়াসের। নতুন জ্ঞান ও চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে একদিকে পুরনো ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করতে হয় অপর দিকে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাকে নির্দিষ্ট চিন্তাধারার আলোকে নতুন করে গড়ে তুলতে হয়। এভাবে সমগ্র সমাজের মনোজগতে এমন আধিপত্য বিস্তারের প্রয়োজন হয় যার ফলে সকলেই সেই বিশেষ পদ্ধতিতেই ভাবতে ও অনুভব করতে আরম্ভ করে। আগে যে মূল্যবোধ ও মানদণ্ডে মানুষকে যাঁচাই করা হতো, তা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়ে নতুন মূল্যবোধ ও মানদণ্ড চালু করতে হয়। তার ভিত্তিতে নতুন চরিত্র ও নতুন প্রকৃতি সম্পন্ন মানুষ তৈরী করতে হয়। একদিকে পুরনো সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সমূলে উৎখাত করতে ও অপরদিকে নতুন মূলনীতির আলোকে গোটা সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়।

সুতরাং বিশ্ববাসীকে সম্ভাব্য অন্ধকার যুগ থেকে বাঁচাতে ও ইসলামের অমূল্য রত্নে ভূষিত করতে হলে এ সুষ্ঠু ও নির্ভুল মতবাদটি হস্তগত হওয়াই যথেষ্ট নয়—সেই সাথে তার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি নিষ্ঠাবান ও সৎ মানব-গোষ্ঠীর এগিয়ে আসাও প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন এমন একটি কর্মী বাহিনীর যাদের ঐ মতাদর্শের ওপর সাচ্চা ঈমান ও অবিচল আস্থা রয়েছে। তাদেরকে সবার আগে প্রমাণ করে দেখাতে হবে ঐ মতাদর্শের প্রতি তাদের নিজেদের ঈমান কতখানি মজবুত। যে শক্তি ও কর্তৃত্বের প্রতি তাদের বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে, আগে নিজেরাই তার অনুগত ও ফরমাবরদার হবে। যে নীতি ও নৈতিকতাকে তারা সঠিক ও বিশুদ্ধ বলে বিশ্বাস ও প্রচার করছে আগে নিজেরাই হবে তার যথার্থ অনুসারী। যে জিনিসকে তারা ফরয বা অবশ্য করণীয় বলে জেনেছে প্রথমে নিজেরাই তা মেনে চলবে এবং যাকে তারা হারাম বা অবৈধ মনে করছে আগে নিজেরাই তা বর্জন করে চলবে। এভাবে ঐ আদর্শের প্রতি নিজেদের নিষ্ঠা আগে প্রমাণ করে দেখাতে না পারলে তার ওপর তাদের আস্থা আছে কিনা, সেটাই হয়ে পড়বে সন্দেহযুক্ত। তেমন হলে অন্যেরা তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করতে এগিয়ে আসতে চাইবে না। কিন্তু শুধু এটুকুই যথেষ্ট নয়, এ পতনোন্মুখ সভ্যতা, সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে

কার্যত বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার সাথে ও তার অনুসারীদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদও করতে হবে। এ ব্যবস্থার সাথে তাদের যে সুযোগ-সুবিধা, স্বার্থ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আরাম-আয়েশ জড়িত রয়েছে তাও পরিত্যাগ করতে হবে। এভাবে একটা প্রতিষ্ঠিত বিজয়ী সভ্যতার সাথে সংঘাত ও বিদ্রোহের অনিবার্য ফল হিসেবে যেসব ক্ষয়-ক্ষতি, বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে, তাও ক্রমে ক্রমে বরদাশত করে নিতে হবে। একটা খারাপ ব্যবস্থার আধিপত্য উৎখাত করতে ও তার জায়গায় একটা সুষ্ঠু ও ভালো ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে যা যা করা দরকার অতপর তাও তাদের করতে হবে। এ ধরনের একটা বিপ্লবাত্মক কার্যক্রমে অংশ নিতে গিয়ে বহু মূল্যবান সম্পদ ও সময় ব্যয় করতে হবে। মস্তিষ্ক ও শরীরের সবরকমের শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। জেল-যুলুম, নির্বাসন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং পরিবার-পরিজনের জান-মালের সর্বনাশ হওয়ার আশংকাও দেখা দেবে।

এমন কি সময়ে প্রাণও দিতে হবে। এসব পথ অতিক্রম না করে পৃথিবীতে কোনো বিপ্লব কখনো সাধিত হয়নি, আজও হতে পারে না। একটা সুষ্ঠু ও সুন্দর মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এরূপ নিবেদিত প্রাণ একদল লোক যতক্ষণ এগিয়ে না আসবে, ততক্ষণ সে মতবাদ যতই উঁচুদরের হোক না কেন, বই কেতাবের পাতা থেকে নেমে সরাসরি মাটিতে শিকড় গেড়ে বসতে পারে না। মতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য তার নীতিমালার শক্তিমত্তা যতখানি প্রয়োজন, উক্ত মতবাদে বিশ্বাসী মানুষগুলোর চরিত্রের বলিষ্ঠতা, কর্মোদ্দীপনা এবং ত্যাগ ও কুরবানীর সমন্বিত শক্তিও ঠিক ততখানি প্রয়োজন। জমিতে ফসল উৎপাদনের প্রক্রিয়া এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভালো ফসল উৎপাদনে সুষ্ঠু কৃষি পদ্ধতি, উত্তম বীজ, সামঞ্জস্য পূর্ণ আবহাওয়া—এ সবেরই যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু মাটি শুধু এতেই সুন্তুষ্ট হয় না। সে এতটা বাস্তববাদী যে, কৃষক যতক্ষণ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অটুট ধৈর্য ও অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা তার ওপর নিজের অধিকার প্রমাণ না করে ততক্ষণ সে তাকে সোনালী ফসলে পরিপূর্ণ মাঠের ডালি উপহার দিতে রাজী হয় না।

এভাবে পরিপূর্ণ নিষ্ঠা এবং কুরবানী ও আত্মত্যাগের প্রেরণা প্রত্যেক মতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য, চাই তা সত্য হোক অথবা বাতিল। কিন্তু বাতিল মতবাদের তুলনায় সত্য মতবাদ প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠা ও ত্যাগের প্রয়োজন অনেক বেশী। বস্তুত সত্য এক অতি সূক্ষ্মদর্শী ও দক্ষ স্বর্ণকার। সে বিন্দুমাত্র ভেজালও গ্রহণ করতে রাজী হয় না। সে চায় একেবারে নির্ভেজাল খাঁটি সোনা কঠিন অগ্নী পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সমস্ত মেকী পুড়ে গিয়ে খাঁটি সোনা বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত সে তাকে বাজারে ছাড়তে দিতে ও তার নামে চালু হতে দিতে প্রস্তুত হয় না। মেকীর দায়িত্ব নিতে সে নারাজ।

কেননা সে সত্য। সে বাতিলের ন্যায় জাল মুদ্রা বা ভেজাল সোনা বাজারে ফেরী করে বেড়াতে পারে না। এজন্যই কুরআন একাধিকবার বলেছে ঃ

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ط - ال عمران : ١٧٩

"তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ, মু'মিনদেরকে সেই অবস্থায় থাকতে দেয়া আল্লাহর রীতি নয়। (অর্থাৎ মু'মিন ও মুনাফিক মিলেমিশে থাকা) খাঁটি ও মেকী বাছাই না করে আল্লাহ ক্ষান্ত হবেন না।"−সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৯

اَحَسِبَ النَّاسُ اَن يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَايُفْتَنُوْنَ ○ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ○

"লোকেরা কি ভেবেছে যে, 'ঈমান এনেছি' বললেই পরীক্ষা না করেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে ? অথচ তাদের পূর্ববর্তীদের (অর্থাৎ যারাই ঈমান আনার দাবী করেছে) আমি পরীক্ষা না করে ছাড়িনি। কাজেই এটা অবধারিত সত্য যে, কে সত্যবাদী কে মিথ্যাবাদী তা আল্লাহ নির্ণয় করবেনই।"−সূরা আল আনকাবুত ঃ ২-৩

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ط مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوا حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ط - البقرة : ٢١٤

"তোমরা কি মনে করেছ যে, এখনই তোমরা বেহেশতের ছাড়পত্র পেয়ে যাবে ? অথচ তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর দিয়ে যে অবস্থা গেছে তোমাদের ওপর দিয়ে তা এখনও যায়নি। তাদের ওপর এমন বিপদ মুসিবত এসেছে যে, তারা নাজেহাল হয়ে পড়েছে এবং রসূল ও তাঁর সাথী মু'মিনরা চিৎকার করে বলে উঠেছেঃ আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে ?"

−সূরা আল বাকারা ঃ ২১৪

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتْرَكُوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً ط - التوبة : ١٦

"তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদের এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে ? অথচ এখনও আল্লাহ যাঁচাই করে দেখলেন না তোমাদের মধ্যে কে জিহাদের দায়িত্ব পালন করেছে এবং আল্লাহ তাঁর রসূল ও মু'মিনদের ছাড়া আর কারো সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখেনি।"−সূরা আত তাওবা ঃ ১৬

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ ط وَلَئِنْ جَآءَ نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ط اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ○ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ○ - العنكبوت : ١٠-١١

"কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা বলে আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি। কিন্তু যখনই আল্লাহর পথে তাদের নির্যাতন করা হয়েছে, তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহর আযাবের মত ভয় করেছে। আবার যদি তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে বিজয় আসে, তাহলে ঐ লোকেরাই এসে বলে, আমরা তোমাদের সাথেই ছিলাম। আল্লাহ্ কি দুনিয়াবাসীর মনের অবস্থা অবগত নন ? আসল ব্যাপার হলো, মু'মিন কে, আর মুনাফিক কে, তা আল্লাহ্ অবশ্যই নির্ণয় করে ছাড়বেন।"–সূরা আল আনকাবূত ঃ ১০-১১

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ○ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ لا قَالُوْآ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قف وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ○ - البقرة : ١٥٥-١٥٧

"আমি অবশ্যই তোমাদের ভীতিজনক অবস্থা, ক্ষুধা এবং জানমাল ও উৎপাদনে ক্ষয়ক্ষতি ঘটিয়ে পরীক্ষা করবো। এসব অবস্থার মধ্যেও যারা ধৈর্যধারণ করে এবং বিপদ-মুসিবত এলেও যারা বলে, আমরা আল্লাহরই জন্য এবং আল্লাহর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে, তাদেরকে সুসংবাদ দাও। এ ধরনের লোকদের ওপর তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও করুণা ধারা বর্ষিত হয় এবং তারাই হয় সুপথপ্রাপ্ত।"

এসব কথা বলার সাথে সাথে কুরআন এ সতর্কবাণীও উচ্চারণ করেছে যে ঃ

وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ لا وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ط

"আল্লাহ্ যদি চাইতেন তবে নিজেই তাদের পর্যুদস্ত করে দিতেন। তবে তোমাদের এক দলকে দিয়ে অন্য দলকে পরীক্ষা করাই আল্লাহর রীতি।"–সূরা মুহাম্মদ ঃ ৪

অর্থাৎ এরূপ ভেবনা যে, আল্লাহ্ নিজে তার বিরুদ্ধাচরণকারীদের দমন করতে পারেন না বলে তোমাদের সাহায্য চান। তিনি এমন শক্তিশালী যে, ইচ্ছা করলে চোখের ইশারাতেই তাদের ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং নিজের মনোনীত জীবনব্যবস্থা নিজেই কায়েম করে দিতে পারেন। কিন্তু এ জিহাদ,

পরিশ্রম এবং ত্যাগ ও কুরবানীর দায়িত্ব তোমাদের ওপর এজন্যই অর্পণ করেছেন যে, মানুষকে দিয়ে মানুষের পরীক্ষা নেবেন এটাই তাঁর ইচ্ছা ও লক্ষ্য। বাতিলপন্থীদের সাথে মু'মিনদের সংঘাত ও সংঘর্ষ না ঘটা পর্যন্ত এবং সেই সংঘর্ষের ফলে বিপদ-মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত কে সাচ্চা মু'মিন এবং কে মিথ্যা ঈমানের দাবীদার তা নির্ণীত হওয়া সম্ভব নয়। আর যতক্ষণ অযোগ্য লোকদের মধ্য থেকে যোগ্য লোকেরা বাছাই হয়ে বেরিয়ে না আসবে ততক্ষণ খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারে এমন একটা সংগঠন তৈরী হওয়াও অসম্ভব।

সুতরাং একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, একটা সঠিক ও নির্ভুল মতবাদ হস্তগত হবে কি হবে না সেটা সমস্যা নয় এবং দুনিয়ার ভবিষ্যত তার ওপর নির্ভরও করছে না। কেননা তেমন একটা নির্ভুল মতবাদ যথারীতি বিদ্যমান। আসল সমস্যা হলো, সাচ্চা ঈমানের বলে বলীয়ান এমন একদল মানুষ সংঘবদ্ধ হবে কিনা যারা প্রতিজ্ঞায় অটল, লক্ষ্যে অবিচল এবং আল্লাহর পথে সর্বস্ব বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত নয়। বস্তুত এ প্রশ্নের জবাবের ওপরই দুনিয়ার ভবিষ্যত নির্ভরশীল।

কেউ কেউ আমাদের বলেন, এমন চরিত্রের লোক এ যুগে কোথায় পাওয়া যাবে? এ জাতীয় লোক ইতিহাসের এক শুভ মুহূর্তে পয়দা হয়েছিল। তারপর স্রষ্টা আর তেমন লোক তৈরী করেন না। মানুষ তৈরীর সেই মডেলটি অতপর চিরদিনের জন্য পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু আসলে একথা ঠিক নয়। এটা একটা অলীক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। নিজেদের ব্যাপারে যারা নৈরাশ্যে ভোগেন কেবল তাদের মনেই বাসা বেঁধেছে এ অলীক ধারণা। সকল যুগেই সব ধরনের যোগ্যতার অধিকারী লোক দুনিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে। মুনাফিক প্রকৃতির লোক এবং আয়েশী ও দুর্বলচেতা লোক যেমন সবসময়ই পাওয়া যেত এবং আজও পাওয়া যায়, তেমনি একটি মতাদর্শের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার পর তাকে বিজয়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে এমন লোকও প্রত্যেক যুগেই পাওয়া যেত এবং আজও পাওয়া যায়। আজ প্রত্যেকেই স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে, হিটলারের প্রতি ও জার্মান আধিপত্যবাদের ওপর ঈমান আনার কারণে একজন দুজন নয় বরং হাজার হাজার লোক উড়োজাহাজ থেকে সরাসরি শত্রুর দেশে লাফিয়ে পড়ছে। অথচ তারা জানে যে, সেখানে অসংখ্য দুশমন শিকারীর ন্যায় তাদের জন্য ওঁৎ পেতে রয়েছে। রুশ বিপ্লবের ইতিহাস পড়লে জানা যায়, হাজার হাজার মানুষ বিপ্লবী মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে একাধিক্রমে অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী সবরকমের ত্যাগ স্বীকার করেছে। তাদের সাইবেরিয়ার কনসেনটেশান ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে। ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে। নির্বাসন দণ্ড নিয়ে তারা দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে। ব্যক্তিগত সুখ, স্বাচ্ছন্দ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মুখে ছাই দিয়ে

ভিটেবাড়ী থেকে উচ্ছেদ হওয়াকে তারা হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে। অথচ তখনো জার সাম্রাজ্যের পতনের কথা কারো কল্পনায়ও আসতো না।

দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, খোদ ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক। রক্তপাত ও সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করা যাবে এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এখানকার একদল তরুণ সবরকমের ঝুঁকি নিয়েছিল। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের খাতিরে তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করা সহ যে কোনো রকমের মারাত্মক পরিণতির মুখোমুখি হতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। এমন কোনো বিপদ মুসিবতের কথা উল্লেখ করা যাবে না যা তারা বরণ করে নেয়নি। কারাগারে লোমহর্ষক নির্যাতন, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, ফাঁসির কাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন কোনোটাই বাদ যায়নি। তাদের কর্মপদ্ধতি ভুল ছিল কি নির্ভুল ছিল, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তবে জীবনের একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করার পর তার পেছনে জানমাল ও ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দেয়া এবং সীমাহীন দুর্ভোগ ও দুঃখ-যাতনা ভোগ করতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার দুর্লভ গুণ যে আজও মানুষের মধ্যে একেবারে অনুপস্থিত নয়, সেটা এ থেকে অবশ্যই প্রমাণিত হয়।

গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের সময় এ ভারতবর্ষেরই কত লোক পুলিশী জেল-যুলুম, সহায়-সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করেছে ; তার ইয়ত্তা নেই। বারদুলীর কৃষকদের জমিজমা, সহায়-সম্পদ, গবাদি পশু এমনকি ঘরের আসবাবপত্র ও ঘটিবাটি পর্যন্ত নিলাম ও বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা তাতে বিচলিত হয়নি। ধীর শান্তভাবে সবকিছু বরদাশত করেছে। এ ইতিহাস কার অজানা ? এরপরও কোন্ যুক্তিতে বলা যায় যে, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানীর যে গুণ আগেকার মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, আজকের যুগের মানুষ তা থেকে বঞ্চিত ? হিটলার, কার্লমার্কস ও গান্ধীর ওপর 'ঈমান' এনে মানুষ যদি এতসব অসাধ্য সাধন করতে পারে, তাহলে আল্লাহর ওপর ঈমান এনে কি কিছুই করতে পারে না ? স্বদেশের মাটির প্রতি যদি মানুষের এতবেশী আকর্ষণ থেকে থাকে যে তার জন্য মানুষ জানমালের ত্যাগ স্বীকার করতে পারে, তাহলে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের প্রতি কি এতটুকু আকর্ষণও সৃষ্টি হতে পারে না ? কাজেই ভীরু, কাপুরুষ ও দুর্বলচেতা লোকদের একথা বলার কোনোই অধিকার নেই যে, এ মহৎ কাজ সমাধা করতে যেসব বীর পুরুষের প্রয়োজন, তা কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য নিজেদের বেলা তারা হযরত মূসা আ.-এর সহচরদের ভাষায় বলতে পারে ঃ

فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ○ ـ المائدة : ٢٤

"যাও তুমি আর তোমার রব লড়াই করগে, আমরা এখানেই বসে রইলাম।"

–সূরা আল মায়েদা ঃ ২৪

(মাসিক তরজুমানুল কুরআনের ১৯৪১ সালের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত।)

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

- তাফহীমুল কুরআন (১-১৯ খণ্ড)
  – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- শব্দে শব্দে আল কুরআন (১-১৪ খণ্ড)
  – মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
- শব্দার্থে আল কুরআন (১-১০ খণ্ড)
  – মতিউর রহমান খান
- সহীহ আল বুখারী (১-৬ খণ্ড)
  – ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী র.
- সুনান ইবনে মাজা (১-৪ খণ্ড)
  – আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা র.
- শারহু মাআনিল আছার (তাহাবী শরীফ) (১-২ খণ্ড)
  – ইমাম আবু জাফর আহমদ আত তাহাবী র.
- সীরাতে সরওয়ারে আলম (১-২ খণ্ড)
  – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- ইসলাম প্রচারের হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি
  – আল্লামা আল বাহী আল খাওলী
- ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন
  – আবদুল মান্নান তালিব
- আল কুরআনের শৈল্পিক সৌন্দর্য
  – সাইয়েদ কুতুব
- ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয়
  – মোস্তফা মাশহুর
- তাফসীরে সাঈদী
  – মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
- পত্রাবলী (১-২ খণ্ড)
  – সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী র.
- সংগ্রামী নারী
  – মুহাম্মদ নূরুয্যামান
- ইসলামী সমাজে নারী
  – সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী
- মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি
  – অধ্যাপক গোলাম আযম